ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 956-964
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.311

মার্ক্সীয়তত্ত্বের বীক্ষণে: মনোজ মিত্রের ‘নরক গুলজার’

সত্য দাস, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 13.03.2026; Accepted: 16.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In Marxist philosophy, art and literature serve as the superstructure built upon an economic base. Although playwright Manoj Mitra was not a formal Marxist, his work Narak Guljar deeply aligns with these principles by championing the oppressed against systemic exploitation. The play reflects the simplified class conflict of the modern bourgeois era, dividing society into two primary groups:

The Bourgeoisie: Represented by the landlord Ghorui and factory owner Batul Biswas. They own the means of production and maintain power by exploiting the labor and dreams of the working class.

The Proletariat: Represented by Manik, Phullara, and their children. Lacking their own means of production, they must sell their labor to survive, caught between the crushing pressures of rural and urban life.

A pivotal character, Sadhak Guibaba, functions as a tool for the capitalist regime, mirroring the religious-political manipulation seen in Tagore’s Raktakarabi. Despite the grim reality where the youth and vitality of the poor are ‘simmered away,’ the play ends on a note of revolutionary hope.

Rather than surrendering to the bourgeois representatives, the protagonists choose to fight. By leaving the ‘heaven’ of the elite and entering a new world of struggle, they embody the classic Marxist sentiment: they have nothing to lose but their chains. Their journey is not just one of survival, but a definitive fight for liberation and the restoration of human dignity.

Keywords: Bourgeoisie, Proletariat, Power, Exploitation, Consciousness, Struggle

ক

মনোজ মিত্র বাংলা নাট্যজগতে একটি বিশিষ্ট নাম। পূর্ব-বাংলার সাতক্ষীরা জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে পথচলা শুরু করে তাঁর কলকাতায় আসা। তারপর দক্ষতায় প্রতিভায় লেখনীতে অভিনয়ে অধ্যাপনায় এই অলরাউন্ডার মানুষটি আপামর বাঙালির মন জয় করেন। বাংলার এই কিংবদন্তি অভিনেতা ও নাট্যকার, তার নিজের হাতে বাংলা থিয়েটারের খোলনলচে বদলে প্রায় ছয় দশক ধরে বাংলা থিয়েটার জগতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের অধ্যাপক। শেষদিকে দীর্ঘদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় মৃত্যুর ভুয়ো খবর রটেছে বারবার। অবশেষে ১২ নভেম্বর ২০২৪, হেমন্তের সকালে সেই খবর সত্যি হয়, শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই বর্ষীয়ান অভিনেতা। তবে বাঞ্ছারাম চলে গেলেও তাঁর সাজানো বাগান পাঠক এখনও সযত্নে আগলে রেখেছে। তাঁর ‘সাজানো বাগান’, ‘নরক গুলজার’, ‘চাকভাঙা

মধু', 'শিবের অসাধ্যি', 'অশ্বত্থামা', 'নেকড়ে', 'মেষ ও রাক্ষস', 'রাজদর্শন', 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা', 'নৈশ ভোজ', 'কিনু কাহারের থেটার', 'শোভাযাত্রা', 'পুঁটি রামায়ণ' ইত্যাদি নাটকে তিনি স্বতন্ত্র নাট্যশৈলী, চরিত্র নির্মাণ এবং থিয়েটারের নিজস্ব ধারা তৈরির মাধ্যমে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে সমসাময়িক সমাজের সমস্যা, নানা অসঙ্গতি, ব্যক্তি-মানুষের মনস্তত্ত্ব, শোষণ ও ব্যক্তির সংকটকে যেমন কৌতুক ও গভীর জীবনবোধের মিশেলে তুলে ধরেছেন, তেমনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যরীতির মিশ্রণে তিনি এক নতুন ধারা তৈরি করেন, যেখানে পুরাণ ও লোককথার রূপক ব্যবহার দেখা যায়।

শুধু 'নরক গুলজার' নয়, তাঁর অন্যান্য অনেক নাটকে শোষিত মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখা যায়। শোষিত মানুষরা যখন সংঘবদ্ধভাবে লড়াইয়ে নামে তখন শোষক শ্রেণি পালাতে বাধ্য হয়। 'চাকভাঙা মধু' নাটকে জমিদার অঘোর ঘোষের বিরুদ্ধে বাদামীসহ সমস্ত গ্রামের জাগরণ সেই শ্রেণিসংগ্রামকেই স্পষ্ট করে। মনোজ মিত্র তাঁর 'নেকড়ে' নাটকেও শাসক-শোষিতের সংগ্রামে শোষিতের পাশে দাঁড়িয়েছেন। 'রাজদর্শন', 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' নাটকে অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক, রাজনৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। মনোজ মিত্র কমিউনিস্ট পার্টির বা গণনাট্যের সদস্য ছিলেন না ঠিকই তবুও গণনাট্যগুলির সঙ্গে তাঁর 'শিবের অসাধ্যি' 'নেকড়ে', 'মেষ ও রাক্ষস', 'নৈশ ভোজ' অথবা 'চাকভাঙা মধু'-র খুব একটা পার্থক্য নেই। তবে আমাদের বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের বিষয় যেহেতু 'মার্ক্সীয়তত্ত্বের বীক্ষণে: মনোজ মিত্রের 'নরক গুলজার', তাই আমরা এখন কেবল 'নরক গুলজার'-কেই পর্যালোচনার কেন্দ্রে রাখবো।

খ

বাংলা নাট্যসাহিত্যে মার্ক্সীয় তত্ত্বের প্রয়োগ ও উদাহরণ:

আলোচনার শুরুতেই আমরা বুঝে নেবো মার্ক্সীয় সাহিত্য বলতে আমরা কী বুঝি? আমরা জানি, কার্লমার্ক্স ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস, ইতিহাস, দর্শন ও অর্থনীতির জগতে যতটা গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকৃত, নন্দনতত্ত্বের জগতে ততটা অবশ্যই নয়। তবে মার্ক্স ও এঙ্গেলস দুজনেই ছিলেন সাহিত্যরসিক- এ গল্পটা অনেকেই জানেন না। মার্ক্স শুধু যৌবনে কবিতা লেখেননি, হাইনে, গ্যেটে, শেক্সপীয়র, বালজাক— প্রত্যেকের সাহিত্যের সঙ্গে ছিল তাঁর নিগূঢ় যোগাযোগ। তবে তাঁরা সাহিত্যকর্মকে অন্যান্য সৃজন প্রক্রিয়া থেকে পৃথক করে ভাবেননি। ফলে সাহিত্য বিচারের জন্য কোনো সরলরেখ পথের নির্দেশও দেননি। সুতরাং সেক্ষেত্রে কোন ধরনের সাহিত্য বিচার পদ্ধতিকে মার্ক্সীয় বলে গণ্য করা যাবে তা তর্কাতীত নয়। ১৮৯০ এর ২১/২২ সেপ্টেম্বর তারিখে যোসেফ ব্লকের কাছে লেখা একটি চিঠিতে এঙ্গেলস জানিয়েছেন- অর্থনৈতিক দিকটির উপর অতিরিক্ত গুরুত্বদানের যে ত্রুটি তরুণদের লেখায় দেখা যাচ্ছে তার জন্য তিনি এবং কার্লমার্ক্স দায়ী।[১] এঙ্গেলসের এই চিঠি থেকে যা বোঝা যায় তা হল অর্থনৈতিক অবস্থা ও সাহিত্যকর্মের মধ্যে তাৎক্ষণিক সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রবণতা এঙ্গেলসের দ্বারা সমর্থিত নয়। অর্থাৎ মার্ক্স পন্থায় সাহিত্য বিচার মানে কোনো দেশের সাহিত্যের জন্মকালীন সবকিছু বাদ দিয়ে সে দেশের অর্থনীতিকে সাহিত্যের একমাত্র জন্মকারণ রূপে গণ্য করা নয়। শিল্প হল মার্ক্স-এঙ্গেলসের মতে সমাজ চৈতন্যের অন্যতম রূপ। সমাজ চৈতন্যের অন্যান্য প্রকাশ অর্থাৎ ধর্ম, দর্শন, অর্থনীতি সবই সাহিত্যের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ। মার্ক্সীয় দর্শনে অর্থনীতি হল 'ভিত' এবং শিল্প সাহিত্য হল সেই ভিতের উপরে গড়ে ওঠা 'অধিসৌধ'। কিন্তু অনেকসময় ভুলে যাই আমরা এ কথা। আমদের পন্ডিতসমাজ অনেকসময়ই মার্ক্স ও তাদের উত্তরসূরিদের নানা মন্তব্যকে অপব্যাখ্যা করে এক মেধাহীন তাত্ত্বিক আলোচনায় মেতে ওঠে। ১৯০৫ সালে ১৩ই নভেম্বর তারিখে 'নোভায়া ঝিজন' পত্রিকায় ১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'পার্টি অর্গানাইজেশন অ্যান্ড পার্টি লিটরেচর' প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে লেনিনের বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছে। আর এই বিভ্রান্তির জন্য মোটেই লেনিন দায়ী নয়। আসলে মার্ক্সবাদের স্রস্টা-প্রবক্তা-ব্যাখ্যাকারদের গ্রন্থ-প্রবন্ধ-ভাষণ পাঠ

করার একটা মার্ক্সীয় পদ্ধতি আছে। আমরা কি মনে রাখি সে কথা? 'পার্টি লিটরেচর' কথাটার বাংলা তর্জমা করতে গিয়ে আমরা লিখি 'পার্টি সাহিত্য', কিন্তু য়ুরোপীয় ভাষায় 'লিটরেচর' আর আমাদের 'সাহিত্য' কি সবসময় এক? লিটরেচর শব্দটার একটা অর্থ 'সাহিত্য', তবে শব্দটির আরেকটি মানে জ্ঞানচর্চার কোনো একটা বিষয়ে যেসব গ্রন্থ, পুস্তিকা পাওয়া যায় সেগুলো- যেমন প্রেসার কুকার কিনলে তার সঙ্গে ব্যবহার প্রণালী এবং গুণাগুণ সম্বন্ধে ছোট পুস্তিকা থাকে, সেটা ঐ বস্তুর লিটরেচর। অনেক ওষুধের মোড়কেও 'লিটরেচর' থাকে।[২] পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি, লক্ষ্য, কার্যক্রম, সংগঠন বিষয়ে যেসব পুস্তিকা প্রকাশিত হয় সেগুলিকে পার্টি লিটরেচর বলে। লেনিনের প্রবন্ধটি পার্টির নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে, কোনো সাহিত্য সম্বন্ধে নয়- এটা কি আমরা আজও বুঝে উঠতে পেরেছি? যাইহোক, সাহিত্যের বিচারে মার্কস-পন্থা কী, সেই বিষয়ে ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-বিচার তত্ত্ব ও প্রয়োগ' গ্রন্থে কিছু সূত্র উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

১. সাহিত্যিক যে ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিতে সাহিত্য রচনা করেছেন তার পরিচয় জানা প্রয়োজন।
২. সাহিত্যে রাজনীতি নানারূপে প্রকাশিত হয়। রাজনীতি-সচেতন এ-কালের মানুষের সাহিত্য থেকে তাই রাজনীতিকে বিযুক্ত করা হয় না।
৩. সাহিত্যকে আগে সাহিত্যরূপে সার্থক হতে হবে। সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের সম্ভাব্য সমাধান কোনো সাহিত্যিকই পাঠকের হাতে তুলে দেন না।
৪. সু-সমালোচক শিক্ষকের মতো লেখকের সমাজ বিষয়ে দৃষ্টিহীনতা ও শৈল্পিক দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলি দেখিয়ে দেবেন।
৫. ফর্ম এবং কনটেন্ট-এর আপেক্ষিক গুরুত্বে কনটেন্ট-এর বিচার অগ্রাধিকার পেলেও ফর্ম-কে উপেক্ষা অনুচিত।
৬. মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচনা হবে একইসঙ্গে বৈজ্ঞানিক এবং শৈল্পিক কর্মকাণ্ড।[৩]

মূল নাটকে আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে এই প্রসঙ্গে অন্যান্য নাটককারদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। আমরা দেখেছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালে বিজন ভট্টাচার্য, সলিল সেন, ঋত্বিক ঘটক, তুলসি লাহিড়ী, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নাট্যকারগণ নতুন জীবনবোধ দিয়ে একটি গণচেতনার ধারা তৈরি করেছিলেন। যদিও এর আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অনেকেই সাম্রাজ্যবিরোধী নাটক লিখেছিলেন, তবে তাতে রাজনীতি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক ছিল না। এখানেই উৎপল দত্ত ব্যতিক্রম। তাঁর কাছে নাটক শখের ছিল না, তিনি মনে করতেন নাটক মানে সংগ্রামের হাতিয়ার। গণনাট্য সংঘে যোগদান শুধু নয়, তিনি সমাজের শোষিত, নিপীড়িত গণমানুষের অধিকারকে তাঁর নাট্যসাধনার কেন্দ্রীভূত বিষয় করেছিলেন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অর্থাৎ মার্ক্সীয় ডায়ালেকটিস-এ বিশ্বাসী উৎপল দত্তের নাটকে গণমানুষই নায়ক, তারাই নাটকের নিয়ন্ত্রক। শ্রেণিসংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লিখেছিলেন, টিনের তলোয়ার, লৌহ মানব, ফেরারী ফৌজ, কল্লোল, তিতুমীর, ব্যারিকেড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। যাইহোক মার্ক্স-এঙ্গেলস এবং তাদের উত্তরসূরীরা সাহিত্য সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তার উপর ভিত্তি করে একালের শ্রেষ্ঠ নাটককার মনোজ মিত্রের 'নরক গুলজার' নাটকটিকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

গ

মনোজ মিত্রের 'নরক গুলজার'–এর কথাবস্তু:

বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের মধ্যলগ্নে পাঠক সমাজ উপহার পেলো 'নরক গুলজার'। সালটা ১৯৭৪। মনোজ মিত্রের সাহিত্যিক জীবনের এক ঐতিহাসিকক্ষণ। যদিও জন্মলগ্নেই নাটকটির কিছু অপূর্ণতা শিল্পীর চোখ এড়ায়নি। আসলে তিনি নাটকটিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন মহাকালের দরবারে; ছুঁতে চেয়েছিলেন শিল্পের

উত্তুঙ্গ শিখর। আর তাই তাঁর সেই সুপ্ত অভিলাষ চরিতার্থতার জন্যই নাটকটিকে আরো পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেন ১৯৭৬ সালে। আর 'নরক গুলজার' নাটকটি হয়ে ওঠে সর্বহারাদের মহাকাব্য। তাঁর লেখা এ যাবৎ প্রায় ৮০ টির নাটকের মিছিলে এই নাটকটিকেই দেখেছি, মুষ্টিবদ্ধ শাণিত হাতে দৃপ্ত পদচারণায় হেঁটে যাচ্ছে পাঠক-দর্শকের হৃদয়ের অলিগলি পেরিয়ে, ভাবিকালের সেই 'সহৃদয় সামাজিক'-এর হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য করে। তবে এই জনপ্রিয় শক্তিশালী নাটকটি প্রথম মুদ্রণের আলো দেখেছিল ১৯৭৭-এ। মুদ্রণের মধ্য দিয়ে ভদ্রবেশে বের হলে ক্রিটিকের দল কিন্তু ধেয়ে আসেনি বরং এদেশে আপামর নাট্যমোদি বাঙালির কাছে অভিনন্দিত হয়েছে নাটকটি। নতুন নতুন ইন্টারপ্রিটেশন নতুন করে মাপতে চেয়েছে তার গভীরতা। যারাই নাটকটির নিবিড় পাঠে মগ্ন হয়েছেন, তারাই নাটকটির বহুমুখী সম্ভবনা আর তার স্বপ্ন- প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সংশ্লেষে হয়েছেন অভিভূত। বারবার, বহুবার।

মূল নাটকের উপর স্পটলাইট ফেললে দেখা যায়, মঞ্চের তিন ভাগ— স্বর্গ, নরক, মর্ত্য। এই ত্রিলোক নিয়েই নাটককারের কারবার। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে এ কোনো রূপকথার গল্প বা পৌরাণিক আখ্যান। কিন্তু নাটকটির সঙ্গে এক নিবিড় পাঠে লগ্ন হলেই দেখা যায়— এ আসলে আমাদেরই ছবি। মনোজবাবু অত্যন্ত সুকৌশলে আমাদের সমাজের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন 'নরক গুলজার'-এর আয়নায়। হ্যাঁ, 'নরক গুলজার' আমাদের বাড়ির কাছের আরশি নগর, আর সেই আরশিতেই ফুটে উঠেছে— ঐ সর্বহারাদের গ্লানি, যন্ত্রণা, তাদের সুখ-দুঃখের বারোমাস্যা। তাই একবার স্বর্গ, একবার নরক ও মর্ত্য করে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরকে এক ফ্রেমে বেঁধে নাটককার এক প্রবহমান নিরবচ্ছিন্নতা গড়ে তুলেছে।

'নরক গুলজার' নাটকটি দুইটি অঙ্কে নির্মিত। প্রথম অঙ্কে- ৪টি দৃশ্য ও দ্বিতীয় অঙ্কে- ৬টি দৃশ্য অর্থাৎ দুইটি অঙ্কে মোট ১০টি দৃশ্যের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এক অখন্ড কথাবিশ্ব। কখনো স্বর্গ, কখনো মর্ত্য বা নরকের মধ্য দিয়ে চলেছে নাটককারের নান্দনিক যাতায়াত।

নাটকের শুরুতেই দেখি ঘোড়ুইমশাই মানিকের বাড়িতে এসে তাঁকে চোরের বদনাম দেয় এবং বলে সাড়ে সাতশো টাকা ফেলতে নতুবা ভিটেমাটি নিঃশর্তে লিখে দিতে। অথচ তাদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে জানা যায় এই মানিকদের মতো অসহায় মানুষদের শোষণ করেই এই ঘোড়ুইদের যত জারিজুরি। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় স্বর্গে দেবতাদের বিলাসের চিত্র। এরপর নরকপুরীতে ডেঞ্জারাস ওয়েস্টবেঙ্গলের সেল, যেখানে খুনি, ডাকাত, সুদখোর মহাজনদের সহাবস্থান। তাদের সকলের দাবী পুনর্জন্ম দিতে হবে। এইভাবে সত্তর দশকের সামজিক- রাজনৈতিক অবক্ষয়কে কৌতুক ও রূপকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে ক্ষমতালোভী শাসক এবং শোষকদের আঁতাত এবং শ্রমজীবী মানুষদের অসহায়ত্ব চিত্রিত হয়েছে।

ঘ

'নরক গুলজার'-এ মার্ক্সীয় তত্ত্বের প্রয়োগ:

সেদিন জন্মমুখে কান্না নিয়ে ভাসান ভেলায় ভাসতে ভাসতে কাঁটাতারের বেড়া গলে ভারতের বেলাভূমিতে আছড়ে পড়েছিল আজকের নাটককার— বাংলা নাট্যজগতের কিংবদন্তী সম্রাট মনোজ মিত্র। সমসাময়িক দেশ-কাল-সমাজ, অনন্ত জিজ্ঞাসা আর তার থেকে উঠে আসা নানা প্রশ্ন তাঁকে দীর্ণ করেছে। তাঁর বিশ্বাস কোথাও স্থাপিত হতে না হতেই, কোনো মহৎ প্রত্যাশার কেন্দ্রে কেলাসিত হয়ে উঠতে না উঠতেই খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেছে। তবু তিনি স্বপ্ন দেখা থামাননি। তাঁর স্বপ্নের নায়কদের হাতে তুলে দিয়েছেন লড়াইয়ের যাদুদন্ড। 'নরক গুলজার' এর মানিক-ফুল্লরারা কিন্তু বুর্জোয়া সমাজের সমাজের প্রতিনিধি ঘোড়ুই বা বাঁটুলের কাছে শেষপর্যন্ত

নতি স্বীকার করেনি। স্বর্গ হতে বিদায় নিয়ে নতুন পৃথিবীতে লড়াইয়ের জন্য তৈরী হয়েছে। তাদের তো শৃঙ্খল ছাড়া হারানোর কিছু নেই। আর তাদের এই লড়াই শৃঙ্খল মোচনের লড়াই।

নাটকের সূত্রপাতেই মঞ্চে প্রবেশ করে ধনতান্ত্রিক কাঠামোর এজেন্ট ঘোড়ুইমশাই। হাতে খেরো বাঁধানো হিসাবের খাতা দেখে তাঁকে পাঠকের চিনতে কোন কষ্ট হয়না। মানিকের বাড়ি প্রবেশ করে উচ্চকণ্ঠে সে জানাতে থাকে তার বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া এক বিশাল ফর্দ। তার কথা শুনে পাঠক-দর্শক যখন মানিককে তার এই কৃতকর্মের জন্য চোরের স্ট্যাম্প মারতে যাবে, ঠিক তখনই মানিকের সপাটে চড় পাঠকের গালে। মানিক জানায় বাপের টিপ সই নকল করে তাদের সাত পুরুষের ভিটে মাটি আত্মসাৎ করেছে ঘোড়ুইমশাই। এ যেন অন্য এক 'উপেন'। মানিক বলে, তার বাপ বলে গেছে—

> "হুই তেঁতুল গাছটা তানার বাপের ছেলো...ধম্মত এবং নেয্যত! তো আপনি নিজের জমির সীমানা লাফে লাফে বাড়াতি বাড়াতি গাছটারে নিজের অর্ন্তভুক্ত করে ফেললেন।"[৪]

পাঠক আঁচ করে এক শোষণের পরম্পরাগত ইতিহাস। মার্ক্স যথার্থই বলেছিলেন-

> "The production of commodities, their circulation, and that more developed form of their circulation called commerce, these form the historical ground work form which it rises."[৫]

এই অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে ঘোড়ুইরা সম্পদের পাহাড় গড়ে। আর এই শোষণের রথচক্র অব্যাহত রাখতে নেয় পুলিশ-প্রশাসনের শরণ। আর বুর্জোয়াদের তৈরি সমাজ ব্যবস্থায় প্রশাসন তাদের হাতের ক্রীড়নক। তাই সেই পুলিশকে ঢাল করেই ঘোড়ুই মানিককে বলে সাড়ে সাতশো টাকা ফেলতে নতুবা ভিটেমাটি নিঃশর্তে লিখে দিতে।

তারপর দ্বিতীয় দৃশ্যে জেগে ওঠে স্বর্গ। এ যেন বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কোনো দেশনেতা-মন্ত্রিদের প্রতিচ্ছবি। যারা সর্বহারা বঞ্চিতদের বিশ্বাসের বৃন্তের উপর ভর করেই টিকে আছে কিন্তু সেইসব মানুষদের নিয়ে ভাববার সময় কোথায় যে সময় নষ্ট করবে! বরং তারা দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বিলাসস্রোতে গা ভাসায়। এ যেন "বিষের জ্বালায় বিশ্ব পুড়ে স্বর্গ তারা মেটান তৃষা।"[৬] একেই মনোজ ব্যঙ্গ করে নারদের মুখে গানে বসিয়েছে-

> "ভগবানের ছানাপোনা দেবতা আছেন নানাজনা
> আয়েসে ফূর্তি করে ফ্যাট গ্যাদার করেছেন...
> অকাজের গোঁসাই তারা কাজের বেলা না।"[৭]

এইভাবে নাটককার নাটকের পরতে পরতে কৌতুকের ভাঁজে ভাঁজে রেখে দিয়েছেন জীবনের নানা চেনা ছবি, নানা গ্লানি। নরকপুরীতে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস নাকি ওয়েস্টবেঙ্গলের সেল, সেখানে খুনি আছে, ডাকাত আছে, আছে সুদখোর মহাজন। তাদের দীর্ঘদিনের দাবী পুনর্জন্ম দিতে হবে। নশো স্মারকলিপি পড়েছে জমা। এরই মধ্যে চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মাকে স্মরণ করিয়ে দেয় বঙ্গশ্রী বাঁটুল বিশ্বাসের মৃত্যুদিনে যমের সেখানে উপস্থিত হবার কথা। কে এই বঙ্গশ্রী বাঁটুল? ইনি একজন বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি। তার 'দশখানা বাড়ি, দশখানা গাড়ি, দশটা বড়ো বড়ো কলকারখানার মালিক।'— তার এই প্রভূত সম্পত্তি ঐই মেহনতি মানুষদের রক্তের-ঘামের বিনিময়েই গড়ে উঠেছে। এহেন পুঁজিপতি শ্রেণির মানুষদের মারার জন্য ব্রহ্মার কাছে ভৎর্সিত হলে সে জানায় তার আরেক ভি-আই-পি মারার কথা-

> "হাতিবাঁধা বিষ্টুপুরের জোতদার বামনদাস ঘোড়ুই। ব্যাটা টাকার কুমীর! তবু গরিবের ভিটে মাটি গ্রাস করবে বলে মানিকচাঁদ নামে ব্যাটা চাষার পশ্চাদ্ধাবন করেছিল।"[৮]

তারপর যম ওটাকে নরকে টেনে নেয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় আসীন সরকার বেছে বেছে এই বুর্জোয়াদের মারাকে ভালো চোখে দেখে না। কেননা বুর্জোয়াদের পুঁজির উপরেই চলেছে রাষ্ট্রব্যবস্থা। বুর্জোয়া ও রাষ্ট্রের রয়েছে গোপন আঁতাত। চিত্রগুপ্তও সে কথাই বলেছে—

> "মর্ত্যের লোকেরাও সন্দেহ করছে ওরা আপনারই লোক। তাই ওদের অত্যাচার যত বাড়ছে, লোকজন ততোই আপনার উপর ক্ষেপছে।"[৯]

এখানে 'ওদের' বলতে সর্বহারার রক্তচুষে ধনী হওয়া মুনাফালোভীরা আর 'লোকজন' বলতে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর সবচেয়ে নীচে বাসকারী মেহনতী মানুষদের কথা বলা হয়েছে।

এর মধ্যে মঞ্চে প্রবেশ করতে দেখি সাধক গুঁইবাবাকে। এরাও সর্বহারা মানুষগুলোর জীবনরস শুষে বেতের মতো লিকলিকে না করে ওদের রেহাই দেয়না। আসলে বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় এরাও একটা শোষণ যন্ত্র। যদি মুদ্রার এক পিঠে থাকে জোতদার ঘোড়ুই, কারখানার মালিক বাঁটুল, তবে অন্য পিঠে আছে সাধক গুঁইবাবারা। এই সাধক সোনার থান ইঁটে সাধনা করেন। তার সহকারী পান্নালালের কাছ থেকে জানা যায়— ওয়েস্টবেঙ্গলে সাড়ে তিন কোটি, আমেরিকায় আরো পাঁচকোটি ভক্ত তার। তাঁর দানপাত্রে টাকা পড়তো, সোনা পড়তো, বাড়ির দলিলও পড়তো।

এরপর দেখি 'নরক গুলজার' এর নরককে সরগরম রাখার ক্ষেত্রে যার অন্যতম কৃতিত্ব - সেই মস্তান নেংটিকে। ওয়াগন ব্রেকার। মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিন হাজার চোদ্দখানা মাল বোঝাই ওয়াগন ভেঙেছে। এইরকমই একদিন ওয়াগন ভাঙার দিনে প্রভাতি সংঘ আর নবারুণ সংঘের সংঘাতের মধ্যে দুই দলের মধ্যে যখন টপাটপ ছোটোখোকা টপকাটপকি চলছে। সেই চরম সংঘাতের চরম মুহূর্তে আপগাড়ির চাকা চলে যায় তার হৃদয়ের উপর দিয়ে। বলি হয় তরুণ প্রাণ-যুবশক্তি। এই বুর্জোয়া নির্মিত সমাজ ব্যবস্থায় তাদের আধিপত্য কায়েম রাখতে এমন অনেক নেংটিকে তারা ভাড়া করে থাকে। এদের কাঁধে ভর দিয়েই বাঁটুল বিশ্বাসরা 'বঙ্গশ্রী' উপাধি পায়। বাঁটুল রূপী নারদের মুখ দিয়ে সেই সত্যই প্রকাশিত—

> "দ্য গ্রেট মাস লীডার। মস্তান, পুলিশ, জোতদার, ব্লাক মার্কেটিয়ার আমার ডান হাত, বাঁ হাত...ওদের আটকে ইয়ার্কি করছো তোমরা। ওদেরই কাঁধে ভর দিয়ে আমি এতদূর উঠেছি।"[১০]

এইভাবে সমাজের নগ্ন বাস্তবতার রূপকে নান্দনিক ভাবে ফুটিয়ে তোলেন নাটককার।

নাটকের প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে দেখা মেলে নাটকের নায়িকার। লকলকে বেতের মতো বেদেনী মেয়ে ফুল্লরা। বালুর চরে ছুটে বেড়াতো, সড়কি চালিয়ে চিতের মাথা ফাটাতো, রাতের বেলায় দল বেঁধে ঢোলে ঘা দিতো। এই বনের পাখিকেই মানিক সংসার বাঁধার স্বপ্ন দেখায়। জোতদারের ভয়ে গ্রাম থেকে পালানো মানিক শহরে পথের ধারে ঝুপড়ির ভিতর সংসার বেঁধেছে। সর্বহারাদের সংসার। খিদের জ্বালায় শিশু কাঁদছে, ঘরে পয়সা নেই, মাথার উপর ছাদ নেই। এমন অবস্থায় প্রেমের বাহুডোরও লোহার শিকল হয়। বুর্জোয়া শ্রেণি পরিবার প্রথা থেকে ভাবালু ঘোমটাটাকে ছিঁড়ে ফেলে, পারিবারিক সম্বন্ধকে পরিণত করে আর্থিক সম্পর্কে। ফুল্লরা ও মানিকের কথোপকথন তুলে ধরলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে—

> "ফুল্লরা।। ঘর ঠিক করেছিস?
> মানিক।। ঘর! কুথায় ঘর?
> ফুল্লরা।। বললি যে কোন মেথরের ধাওড়ায়-ট্যাংরায় না কমনে...।
> মানিক।। ত্রিশ টাকা ভাড়া চায়, তিনশো টাকা আগাম। তিনশোটা পয়সা নেই...।[১১]

এরপর তাদের কথামালা থেকে জানা যায় মালিক যে ঠেলার দাম কেটে নেয় তা আসলে মানিকের মজুরি দিয়ে কেনা নিজের ঠেলা। তার কথায়- "আমার ঠেলা আমি ভাঙলাম, ও শালারা আমারই মজুরি কাটবে?"[১২] এইভাবেই মেহনতি মানুষদের রক্ত-ঘাম-স্বপ্ন নিংড়ে বেঁচে থাকে বুর্জোয়ারা আর তারা কলুর বলদের মত খেটে যায় বেগার, সারা যাপন জুড়ে। মানিকদের মতো সর্বহারাদের একদিকে গাঁয়ের ঠেলা অন্যদিকে শহরের ঠেলা– মাঝখানে সেদ্ধ হতে থাকে তাদের জীবন-যৌবন।

এই হল গল্প। যদিও গল্পটি সবাই জানে। গল্পটি আজকের নয়। শিল্পবিপ্লব উত্তরকাল থেকে এ গল্প আমাদের চেনা, গ্রাম-গঞ্জ-শহর-বস্তিতে সব জায়গায় দেখতে পাই। গল্পের চরিত্ররা মাঝে মাঝে তাদের রূপকথার মায়া ছেড়ে ঘুরে বেড়ায় চোখের সামনে নির্লজ্জভাবে।

মনোজ মিত্র মার্ক্সবাদী ছিলেন কিনা জানা নেই। অন্তত তাঁর স্মৃতিকথা 'গল্পনা' বা অন্যান্য লেখা পত্রে কোথাও প্রত্যক্ষ ভাবে তিনি মার্ক্সবাদের পক্ষে জোরালোভাবে কোনো সওয়াল করেননি অর্থাৎ অনুমান করা যায় তিনি তথাকথিত মার্ক্সিস্ট ছিলেন না। কিন্ত তাঁর স্মৃতিকথার সেই দুগ্গি বউকেই দেখি—

> "ও মাঝি, মাঝি গো খান দুই গোলপাতা দাওনা, ঝুপরিখানা ছাইবো গো, ওই দেখো ছাউনি খসে পড়ছে।"[১৩]

এইভাবে তিনি বারেবারে তুলে ধরেন নিপীড়িত মানুষগুলোর যন্ত্রণা। বোঝা যায় তাঁর কমিটমেন্ট ছিল মানবতার পক্ষে; শোষণের বিরুদ্ধে। তাই তিনি এই নাটকেও যে শোষিত মানুষদের পাশে দাঁড়াবেন- এতে অবাক হবার কিছু নেই।

আমাদের এই বুর্জোয়া যুগের বিশেষত্ব: শ্রেণিবিরোধ এতে সরল হয়ে এসেছে। গোটা সমাজ ভাগ হয়ে পড়েছে দুইটি বিরাট শ্রেণিতে— বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত। বুর্জোয়া মানে বলতে চাইছি, আধুনিক পুঁজিপতি শ্রেণি, যারা সামাজিক উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক এবং মজুরি শ্রমের নিয়োগকর্তা। প্রলেতারিয়েত হল আজকের মজুরি-শ্রমিকেরা, নিজেদের কোনো উৎপাদন উপকরণ না থাকার দরুন যারা বেঁচে থাকার জন্য শ্রমশক্তি বেঁচতে বাধ্য হয়। এই শ্রেণিতত্ত্বের ধারণা নিয়ে 'নরক গুলজার'এ ও দেখি স্পষ্ট দুটি শ্রেণি–

১। অন্ধকারবৃত্তে মানিক-ফুল্লরা, তাদের সন্তান- যারা দিনবদলের স্বপ্ন দেখে;

২। আলোকিত বৃত্তে জোতদার ঘোড়ুই এবং কারখানার মালিক বাঁটুল বিশ্বাস, সাধক গুঁইবাবা।

এই সাধক গুঁইবাবা অনেকটা 'রক্তকরবী'র গোঁসাই চরিত্রের মতো। যিনি ধনতন্ত্র শাসনতন্ত্রের কায়েমী স্বার্থসাধনের অস্ত্র স্বরূপ। অধর্মকে শাস্ত্রের বচনের আড়ালে ধর্ম বলে চালানোই গুঁইবাবাদের কাজ। গুঁইবাবা–পান্নালালদের সাধনার নমুনার একটি ঝলক:

> "হামার কেস ভেরী ভেরী আর্জেন্ট। লাখ লাখ রূপেয়ার বেবিফুড হামার গুদামে পচছে।"[১৪]

এইভাবে বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থায় শোষণের ষোলকলা পূর্ণ হয়।

মনোজবাবু সুকৌশলে নাটকটিতে ব্যঙ্গের মধ্যে শ্লেষের মশলা মিশিয়ে উপস্থাপন করেছেন। ঘোড়ুইবাবুরা কেবল মর্ত্যের শোষণে তৃপ্ত নন, মরণের ওপারেও তাদের সুদের কল চলে, এ যন্ত্রে জং পড়েনা। তাই সে নরকে গিয়ে বলে—

> "গলায় ফাঁসি দিয়ে তোর দলিল আদায় করব। চোদ্দশ টাকা পাই।"[১৫]

শুধু এখানেই শেষ নয়। বিধাতা পুর্নজন্ম দিলেও মানিক যখন আর পৃথিবীতে যেতে চায় না, তখন ঘোড়ুইের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে সেই সত্য-

> "না যাবি তো আমার দুহাজার মেটাবে কে? চাষবাস করবে কে? লাঙল ঠেলবে কে? আমরা সেখানে গিয়ে খ্যাঁচাকল ল্যাটামাছ চুষবো।"[১৬]

প্রতিযুগে শাসকশ্রেণির ভাবধারণাই কর্তৃত্বশালী ভাবধারণা। বৈষয়িক উৎপাদনের উপকরণে যে শ্রেণির আয়ত্তি থাকে সেটাই একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করে মানসিক উৎপাদনের উপায় উপকরণ।[১৭] সেরকমটাই মনে হয় গঙ্গার পারে মনভোলানো সজ্জায় স্বামীর মৃত্যুর পরই ফুল্লরাকে গান গাইতে দেখে। সবাই তো নীলকণ্ঠ হতে পারেনা। অব্যক্ত বেদনা তাই গান হয়ে ঝরে পড়ে কিন্তু যখনই বাবু টাকা ছড়ায়, ফুল্লরা ধীরলয়ের বিষাদ ছেড়ে দ্রুতলয়ে গায়-

> "বাবু পান খাওয়াবে
> ও বাবু গাল রাঙাবে।"[১৮]

ঙ

মানুষ জীবনে যা পায়না, স্বপ্নে তা পায়। মনোজ মিত্র 'নরক গুলজার'কে কৌতুকের আধারে প্রেজেন্ট করেছেন বলেই সর্বহারা শ্রেণির নতুন করে মর্ত্যে গিয়ে লড়াইয়ের স্বপ্ন তাই অস্বাভাবিক ঠেকেনা। নারদ তাই ব্রহ্মার চাল বাঞ্চাল করে সবাইকে পুনর্জন্ম দেয়, বলে-

> "মর্ত্যে আসল বাঁটুল ঘোড়ুই সব ছাড়া রয়েছে, তোমার ছেলেকে গিলে খাবে বলে। শেষ লড়াইটা, ওখানেই হবে। যাও...।"[১৯]

এইভাবে সর্বহারাদের লড়াইয়ের স্বপ্ন দিয়েই শেষ হয় নাটক। সর্বহারাদের যখন পালাতে পালাতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায়, তখন তো ঘুরে দাঁড়াতেই হয়। উদাসীন ঈশ্বর কেঁপে ওঠে তাদের পদাতিক পদক্ষেপে। মানিক বলে—

> "পলাতি পলাতি এসে ঠেকেছি মরণের পারে। এর ওধারে তো আর যাওয়া যায়না! ঐ শেকল রইলো! ওটা এবার হয় তুমি আমারে পরাবে, নয় আমি তোমারে। এসো, চলে এসো!"[২০]

মনোজবাবু তথাকথিত মার্ক্সবাদী না হলেও মানবতার প্রতি 'কমিটমেন্ট' থেকেই তিনি শোষিত মানুষদের পক্ষ অবলম্বন করেন। তিনি নাটকের শেষে স্বপ্ন দেখান— নির্যাতিত মানুষরাই মনুষ্যত্বের দাবীতে আগামীর ইতিহাস রচনা করবে। শাশ্বত রাত্রির বুকে ঘটবে অনন্ত সূর্যোদয়।

তথ্যসূত্র:

১। মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার। সাহিত্য বিচার, মার্ক্সীয় সাহিত্যতত্ত্ব। দেজ সংস্করণ, জানুয়ারি-২০০৫, পৃ. ৮১।
২। ভট্টাচার্য, জ্যোতি। মার্ক্সবাদী পার্টি, সাহিত্য ও সাহিত্যিক। অগ্রণী বুক ক্লাব, বইমেলা- ১৯৯৬, পৃ. ৩৩।
৩। মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার। সাহিত্য-বিচার তত্ত্ব ও প্রয়োগ। চতুর্থ সংস্করণ, জুলাই ২০১৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃ. ৪৪।
৪। মিত্র, মনোজ। নরক গুলজার। কলাভৃৎ পাবলিশার্স, মে, ২০০৮, পৃ. ৭।
৫। মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার। সাহিত্য-বিচার তত্ত্ব ও প্রয়োগ। চতুর্থ সংস্করণ, জুলাই ২০১৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পৃ. ৫০।
৬। ইসলাম, নজরুল। পথের দিশা, সঞ্চিতা। ডি. এম. লাইব্রেরি, অক্টোবর ১৯২৮, পৃ. ১১২।
৭। মিত্র, মনোজ। নরক গুলজার। কলাভৃৎ পাবলিশার্স, মে, ২০০৮, পৃ. ৯।
৮। তদেব, পৃ. ১৩।

১০। তদেব, পৃ. ১৩।
১১। তদেব, পৃ. ২৬।
১২। তদেব, পৃ. ২৭।
১৩। মিত্র, মনোজ। গল্পনা। দে'জ পাবলিশিং, জানু- ২০১৫, পৃ. ৭৩।
১৪। মিত্র, মনোজ। নরক গুলজার। কলাভৃৎ পাবলিশার্স, মে, ২০০৮, পৃ. ৪০।
১৫। তদেব, পৃ. ২০।
১৬। তদেব, পৃ. ৪৫।
১৭। মার্ক্স এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলী, প্রথম খন্ড। প্রগতি প্রকাশন, মস্কো ১৯৭৯, পৃ. ৫৮।
১৮। মিত্র, মনোজ। নরক গুলজার। কলাভৃৎ পাবলিশার্স, মে, ২০০৮, পৃ. ৪৩।
১৯। তদেব, পৃ. ৫৩।
২০। তদেব, পৃ. ৫২।